OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 723 - 729
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নমঃশূদ্র সমাজ : প্রসঙ্গ কয়েকটি পূজা ও ব্রত

ড. কৃষ্ণ কান্ত রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, ধুবড়ী, আসাম
Email ID : krishna04021972@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Partition, mother tongue, vow, Sankranti, childlessness, fertility, palmistry, mental desire, horoscope.

Abstract
In 1947 and 1971, the displaced people from East Bengal come to this side with countless fear, doubts, and conflicts, driven by the need to survive, they had nothing in hand, no roof behind the roots of their lives and once again rooted themselves of resh. They settled down creating new homes, despite all this, they did not want to lose their past. Their innate vibrancy reminded alive. They rebuilt homes, sowed crops, and started an rituals, prayers, folk dance, folk songs and customs, they enriched the realm of folk culture. The rituals and vows that ware once the pride of Society culture now seem to have lost their influence. The relentless grip of globalization has fragmented the vast splendor of folk culture. It's no longer easy to hear the prayers, vows, and songs as before. However, this is not the final word for folk culture dose not die, it only transforms. Folk culture teaches unity, harmony, and connection. It's the teaches spirit of brotherhood.

Discussion

১৯৪৭ এর দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ওপার বাংলা থেকে এসেছিল এপার বাংলায় ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষ ও পূর্বপাকিস্তান সৃষ্টি হলেও কোথাও যেন একটা চাপা দ্বন্দ্বের স্রোত চোরাবালির মত বয়ে চলছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের মধ্যদিয়ে। দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রত্যাখান হল। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষাকে বাংলা দেশের বাঙালী তাকে সজোরে প্রত্যাখান করে আপন মাতৃভাষা গৌরবের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হল। ধর্মের চেয়ে ভাষা অনেক বড়ো। ১৯৫২ তে যেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত হল ১৯৭১ এ সেখানে জন্ম হল বাংলাদেশের। এরপর শুরু হল আরো বিপর্যয়। ওপার বাংলা থেকে পিঁপড়ের শারীর মত মানুষ ছুটে আসে এদেশে। যেখানে অগণিত মানুষের কান্নার চোখের জল বয়ে যায় পদ্মা গঙ্গার জলের স্রোতে। তারি বহিঃপ্রকাশ পায় কবির কলমে –

“এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়ি বারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশাল কেউবা ঢাকায়।” (জলদাও/ বিষ্ণু দে)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিন্নমূল মানুষ বাঁচার তাগিদে আশ্রয় নেয় ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। রনবীর সমাদ্দার সম্পাদিত প্রবন্ধ গ্রন্থের 'Reflection on Partition in the east' এর মোহন্ত মন্ডল এমনি এক চরিত্র। এই সব নিম্নবরগীয় নম:শুদ্র জেলে চাষিরাও থাকতে পারেনি নিজেদের দেশে, নিজেদের ভিটায়। আত্মিক সংকট থেকে উত্তরণ ও বাঁচার তাগিদে কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানা পেশায় নিযুক্ত হলেন। তথ্যনুযায়ী ১৯৯১ সালে উপার্জনশীল নমশূদ্রদের ৭৮ শতাংশই নির্ভরশীল ছিল কৃষিকাজের উপর। গবেষণা প্রবন্ধে এই বিষয় আলোচনা কর হয়েছে মূলত সাধারন প্রান্তিক মানুষের অবস্থান কোন রেখায় অবস্থান করেছে এ বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। তাছাড়া অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তাই নমশূদ্র সমাজের প্রত্যেকটি লোকায়ত অনুষ্ঠান, পূজা, গান, বিশ্বাস, সংস্কার সবেতেই কৃষিভাবনা জড়িয়ে আছে।

লোকায়ত ঐতিহ্যে নমঃশূদ্র সমাজ : দেশ ভাগের রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে অসহায় মানুষগুলো সুখ দুঃখের আতুর ঘরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায় অহরহ। দুঃখের সাতকাহন ভরা সংসারের অভাব তাড়নার জটিল আবহের মধ্যেও বিকিয়ে দেয়নি লোক ঐতিহ্যকে। অহরহ জীবন যাতনার মধ্যেও তারা পালন করে চলছিল লোক দেবদেবীর পুজা ও গান। তারই ঐতিহ্য বহন করে গ্রাম গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে চলছে সূর্য পুজার গান, কাচ নাচ, বুড়ি পুজা, বাস্তু পুজা, মাদার ঠাকুর পুজা, ক্ষেত্র ব্রত, সুমতি ব্রত, গাসসি ব্রত, মচ্ছব, বাইদ্য বাইদ্যনীর গান আরো কতকিছু।

বত্তি বা বাস্তুপুজা : বাস্তু বা বত্তি পুজা মূলত ধরিত্রী মায়ের পুজা। পুজা অনুষ্ঠিত হয় পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন। পুজার সময় ভোর বেলা। মূলত নারীরাই এই পুজায় অংশগ্রহণ করে। বাড়ীর গৃহকর্ত্রী পুজার দিন উপোস থেকে মাটি দিয়ে বাস্তু ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করে। মূর্তি তৈরির আগে উঠনের মাঝখানে সিঁদুর দিয়ে পাঁচটি ফোটা দিতেই হয়। সাধারনত চালের গুড়ো দিয়েই মূর্তি তৈরি করে। মূর্তি তৈরি হলে প্রসাদ হিসাবে দেওয়া হয় তিল, কদমা ও বেলপাতা। এই পুজার দিন কেউ মাটিতে হলকর্ষণ বা মাটিতে আঘাত করতে পারবে না। তাদের বিশ্বাস ঐদিন এরূপ কাজ করলে ধরিত্রী মাতাকে আঘাত করা হয়। রাজবংশী সমাজেও এরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। তারাও আমাতি বা অম্বুবাচীর সময় এক সপ্তাহ ধরে মাটি বা ধরিত্রী মাতাকে আঘাত করেনা। কারন এই সময় ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। তবে সময়ের হেরফের আছে। সে যাই হোক না কেন এই পুজায় আছে কামনার সুর। বাড়ীর গৃহিণী কামনা করে যে তাদের পরিবারের সবাই যেন খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারে। ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রহীন এই পুজা আসলে অনার্য পুজারি সংস্করণ বলে মনে করা যেতে পারে।

নাটাই পুজা : পুজার সময়কাল অগ্রাহায়ন মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতটি মেয়েরাই মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রতটি যে একবার শুরু করবে মাসের চারটি রোববারের করতেই হবে। তবে প্রথম দুটি রোববার ও শেষ রোববার করতেই, হবে। মাঝের রোববার বাদ যাবে। ব্রতের জন্য প্রয়োজন – ১৪টি ভেন্না পাতা, একুশটি দূর্বা ঘাস, একুশটি ধান, একটি ঘট, চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি পিঠে, একটি কাটা পুকুর। ব্রতটির সময়কাল সন্ধ্যা বেলা। যে ব্রতী হবে সে সারাদিন উপোষ থাকবে। বাড়ির উঠনে পুকুর কেটে ঘট বসায়। কাটা পুকুরের বা দিকের ডালায় থাকে ৭টি ভেন্না পাত ও চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি লবন ছাড়া ও লবন যুক্ত পিঠে আর ডান দিকের ডালায় থাকবে অনুরূপ প্রসাদ। এর শুরু হবে পুজা। পুজায় ব্রত কারিনী ব্রত কাহিনি বা হাস্তর বলার সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি ও পুকুরে জল ঢেলে দেবে। এই ব্রত পালন করলে নি:সন্তান সন্তান পায় ও হারানো জিনিষ সহজেই পাওয়া যায়। ব্রতের মূল প্রসাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি রীতি মানা জরুরী। পুজা স্থানের বা দিকের ডালা পুজা শেষে উলু দিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়েই তা আবার বাইরে কোন অন্ধকার স্থানে নিয়ে ঝাঁকি দিয়ে পুনরায় আগের স্থানে এনে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। লোক বিশ্বাসনুযায়ী লবন যুক্ত পিঠা পেলে তার সমস্ত মনস্কামনা পুরন হবে আর যদি লবন ছাড়া কেউ পায় তাহলে তার কামনা অপূর্ণই থেকে যাবে। এই লোকানুষ্ঠান মূলত উর্ব্বরতাকেন্দ্রীক। নাটাই ব্রতের সঙ্গে ত্রিপুরার কল্কিনারায়ন ব্রতের বেশ মিল পাওয়া যায়। যে কারনে উভয় ব্রতের শেষ উক্তি একি। ব্রত শেষে বলা হয় –

"হারাইল ধন ঘরে লয়
যার যার মনের বাসনা পূর্ন হয়।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষেত্তর পুজা : অঘ্রায়ন মাসের দুটো নাটাই ব্রত পুজার পর মঙ্গলবার অথবা শনিবার ক্ষেত্তর পুজা করে। পুজা পুরোপুরি নারীকেন্দ্রিক। পুজার আগের দিন ঘরের সবাই নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। দেবীর কোন মূর্তি নেই। এই ক্ষেত্তর দেবীকে মূলত মা লক্ষ্মীদেবীর একটি রূপ বলে মনে করেন। এই পুজা যারা করবে তার সাত বাড়ি মাগন করে চাল সংগ্রহ করবে। এই চালের গুড়ো দিয়ে নাটাই ঠাকুরের মতন প্রতিকৃতি তৈরি করে। পুজার উপকরণ - বিচা কলা, খই,মোয়া, মুড়ি, বুট ভাজা, বিভিন্ন রকমের ডাল ভাজা, ফুল, দূর্বা, তুলসী, সাতটি বেগুন পাতা, সাতটি কুল পাতা, কলার পাত ইত্যাদি। কলার পাতায় প্রসাদ সাজিয়ে গোয়াল ঘরে রাখা হয় এবং এই প্রসাদ রাখালেরা গ্রহন করে। কুল ও বেগুন পাতার প্রসাদ প্রত্যেক ঘরের চালে সবজি ও অন্যান্য খেতে ছিটিয়ে দেয় চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি ক্ষেত্তর ঠাকুরকে বাড়ির ছোট ছেলেরা চেটে চেটে খাবে। লোক বিশ্বাস - ক্ষেত্তর ঠাকুরে চালের গুড়ো খেলে ছোট বাচ্ছারা বিছানায় প্রস্রাব করে না। ক্ষেত্তর পুজা আসলে ফসল বৃদ্ধি কামনা মূলক পুজা।

সুমতি পুজা : সুমতি পুজা যে কোন সময়, যে কোন মাসে করা যায়। পুজার দিন সোম ও শুক্রবার হতেই হবে। সূর্য ওঠার আগেই পুজা শেষ করতেই হবে। একটি লম্বা পাথরকে দেবী হিসাবে কল্পনা করে। পুজার আগে পাথুরে দেবীকে সর্ষের তেল দিয়ে স্নান ও পাঁচটি সিঁদুরের ফোটা দিতেই হবে। পুজার উপকরন - সাতটি পান, প্রত্যেক পানে সুপারি বাতাসা, খয়ের, জর্দা, ঘট, আমের পল্লব, ফলমূল ও ভোগ প্রসাদ। ফুল বেলপাতা হাতে নিয়ে যখন পুজা করা হয় তখন বলতে হয়–

"এই বত্তের এই কথা, ঘটে দেয় বেলপাতা
হারানো ধন পাওয়া যায়, মনস্কামনা পূর্ন হয়।"[২]

সুমতি দেবীর কাছে সকলে ফুল, বেলপাতা নিয়ে মনস্কামনা করে। এমনিকি বাড়ির অসুস্থ মানুষের জন্যও দেবীর কাছে প্রার্থনা করে। তথ্যদাতা মায়ারানী সরকার বলেন যে কোন বাড়িতে বিয়ের পর সুমতি পুজা করাতেই হয়। দেবীর কাছে যার মানত থাকবে সে সুমতি ঠাকুর ও ঘট মাথায় করে ঠাকুর ঘরে যাবে এবং বাড়ির সকলে উলু ধ্বনি দেবে। এই পুজায় সুমতি ও কুমতির কাহিনি বলা হয়। ব্যক্তি মনস্কামনার সঙ্গে পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করে ব্রতীরা। এই পুজার সঙ্গে সাইটোল বিষহরি দেবীর একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

সূর্য পুজা : সারা পৃথিবী জুড়েই সূর্য পুজার প্রচলন আছে। আদিম সভ্যতায় মানুষ জল, হাওয়া, সূর্য কিরন, বন্যা ইত্যাদি বিপদ থেকে রক্ষা পেতে তাদের দেব দেবী হিসাবে কল্পনা করেছে। প্রাচীন ভারত বর্ষে মুনিরা তপস্যা করেছেন সূর্যের কাছে। এমনকি মহাভারতের সূর্যের ঐরসে জন্ম কর্নের।

কিন্তু লোক মননে সূর্যের পুজা ভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যদিয়ে প্রতিভাস হয়। বিশেষ করে নম:সূদ্র সমাজে সূর্য পুজা ও ব্রত পালন একেবারেই আলাদা। মাঘ মাসের সরস্বতী পুজার দিন থেকে মাঘী পূর্নমার দিন পর্যন্ত সূর্য পুজা চলে। পুজার দিন হতে হবে রবিবার অথবা বৃহস্পতিবার।

সূর্য পূজার আগের দিন উত্তর দক্ষিণ উঠনে মাটি দিয়ে সূরা দেবের বেদী তৈরি করে। পুজা সম্পূর্ণরূপে নারীদের। যারা পূজা দেন তাদের বত্তি বলা হয়। যে নারী প্রথম সূর্য পুজা করবে, সে সকালবেলা স্নান করে ভিজে কাপড়ে প্রদীপ হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকবে। বত্তির চারদিকে সিঁদুর দিয়ে গন্ডি কুন্ডলী কাটা থাকবে। পূর্বে যে বত্তি ছিল সেই একমাত্র একটি পয়সা হাতে নিয়ে কুণ্ডলী কাটবে। গন্ডির ভেতরে থাকা বত্তিকে সূর্যদেবকে কথা দিতে হবে যে পরের বছর সে পুজা করবে। সূর্য পুজা করা হয় সকল ও বিকাল দুটি পর্যায়ে। সকাল বেলার পূজার উপকরণ হিসাবে থাকে – দুটি ঘট, প্রত্যেক বত্তির জন্য আলাদা আলাদা ঘট, প্রদীপ, কলা, পান, সুপারি, আমের পল্লব, গামছা, ধুপতি ইত্যাদি। বিকেল বেলার সূর্য পূজার আগে মাটির বেদীটিকে গাদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সকাল বেলায় পূজার বত্তিরা পূর্ব দিকে মুখ করে থাকে আর বিকেল বেলার পূজায় থাকবে পশ্চিম দিকে মুখ করে। আসলে সূর্যের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজারী বত্তিদেরও দিক পরিবর্তন হয়। সূর্য পূজা গানের কয়েকটি পর্যায় আছে। পর্যায়গুলি হল –

এক. জাগানো গান
দুই. বন্দনা গান
তিন. রূপ বর্ননার গান
চার. রাখাল বেশের গান
পাঁচ. সন্ধ্যা আরতির গান।

প্রথম তিনটি পর্যায়ের গান সকাল বেলার গান, পরের দুটি পর্যায়ের গান বিকেল বিকেল বেলার গান।

এক. জাগানো গান : সূর্য সারাদিনের ঝর ঝাপটা নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে সে ক্লান্ত। তাই সারারাত সে থাকে নিদ্রামগ্ন।কেননা কাল আবার সকাল বেলায় উদয় হতেই হবে। তাই বত্তিরা গানের মাধ্যমে সূর্যদেবকে জাগিয়ে তুলে এক বিশেষ সুর লয়ের মাধ্যমে।

গান :

"ওঠ ওঠ সূর্য ঠাকুর নিশানা ভাঙ্গিয়া
তোমার জন্য দাঁড়ায়ে আছি ঘিয়ের প্রদীপ লইয়া
একশ বত্তি চাইয়া রইয়াছে ভিজা বসন পরে
একশ বত্তি চাইয়া রইয়াছে ঘট হাতে লইয়া।"[৩]

পূজার সমস্ত উপকরণ দিয়ে সূর্যদেবকে নিয়ে গান হবে।

দুই. বন্দনা গান : সূর্যদেবকে কেন্দ্র করে দশদিক বন্দনা করে গানের মধ্যদিয়ে।

গান :

"বন্দি আমি রাম লক্ষন (বন্দি অর্থে বন্দনা)
বন্দি সীতার চরন, জয় জানকী
প্রথমে বন্দনা করি মাতা পিতার চরন (জয় জানকী)
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাশ পর্বত
তাহার মধ্যে বসত করে ভোলা মহেশ্বর।"[৪]

গানের মধ্যদিয়ে দশদিক বন্দনা করে সূর্যদেবকে মাঝখানে স্থান দিতে হয়।

তিন. ঠাকুরের রূপ বর্ননার গান :

গান :

"জলধর গোবিন্দ চরন।
দেখলাম কদম তলায় গৌর সখী
কি রূপ দেখে আসলাম
কৃষ্ণর মাথায় রৌদ্রে গলে
বাতাস পাইলে ঝলকে গো সখী ঝলকে।"[৫]

গানে সূর্যকে কৃষ্ণ রূপের আকারে ধরে কৃষ্ণর সমস্ত দিকের রূপ বর্ননা করে। আসলে বৈষ্ণব আন্দোলন তথা চৈতন্যদেবের প্রভাব ব্যপক ভাবে সারা ফেলেছিল সারা বাংলায়। যার ফলে সূর্যকে কৃষ্ণ রূপেই তাদের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। তাই গানের মধ্যদিয়ে কৃষ্ণর পরশ পাওয়ার জন্য নানা প্রকরনে কৃষ্ণকে সাজিয়ে তোলে -

গান :

"চলো গো সখী আমরা কৃষ্ণর উদ্দেশে যাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।
বিনা জলে চন্দ ঘষি কৃষ্ণরে সাজাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।
বিনা তেলে কাজল পেরে কৃষ্ণরে সাজাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।
বিনি সুতার মালা গেঁথে কৃষ্ণরে সাজাই
হারে, কালো জলে যদি গো কৃষ্ণ পাই।"[৬]

চার. রাখাল বেশের গান : বিকেল বেলায় যখন সূর্য পূজা অনুষ্ঠিত হবে তখন প্রত্যেক বত্তি আতপ ধানের খই নিজের কোচে নেবে। সূর্য ঠাকুরের চারপাশে একবার প্রশিক্ষণ করে এক মুঠো খই নিজের ঘটের সামনে এসে পশ্চিম দিক মুখ করে ছিটিয়ে দেবে। এভাবে কমপক্ষে সাতবার সূর্য ঠাকুরকে কেন্দ্র করে প্রশিক্ষণ করবে আর খই ছিটিয়ে দেবে। বিকেলের গানে সূর্য ঠাকুরকে রাখাল রূপ ধরে বত্তিরা গান গেয়ে থাকে –

'ঘট আনোলো সখী পূজা করবো
ঠাকুর এসে রাখাল বেশে দাঁড়াল।

এভাবেই বত্তিরা পূজার যাবতীয় উপকরণ (ফল, বাতাসা, নাড়ু, খৈ, দুধ, সিঁদুর) গানের ভাষায় তুলে ধরে।

পাঁচ. সন্ধ্যা আরতির গান : বিকেলের পূজা শেষ। প্রত্যেক বত্তি প্রদীপ হাতে নিয়ে সাতবার এগিয়ে যাবে আবার সাতবার পিছিয়ে আসবে। এই সমস্বরে উলুধ্বনি দেয়। এই সময়েই গাওয়া হয় সন্ধ্যা আরতির গান। দুই তিন ধারায় সন্ধ্যা আরতির গান গাওয়া হয়। কিন্তু এখানে একটি ধারার গান উল্লেখ করা হল -

গান :

"আরতি করে ব্রজ মায়া
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।
কৃষ্ণ গুন গাইয়ারে
মঙ্গল আরতি ঢাকো বাজে, ঢোলো বাজে
বাজে করতাল কাসি।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে
বাজে মিলন বানীরে।
মঙ্গল আরতি —
ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, নাচে শিব শঙ্কর
মহামুনি নারদ নাচে, বীনায় দিয়া সুররে।
মঙ্গল আরতি —
চন্দ্র নাচে, সূর্য নাচে, নাচে গ্রহ তারা
পাতালে বাসকী নাচে হইয়া দিশা হারারে।"[৭]

পূজা শেষ হলে প্রত্যেক বত্তি ঘট, প্রদীপ, ধূপ নিজের নিজের ঘরে রেখে দেবে।

মচ্ছব : নমশূদ্র সমাজের একটি আনন্দ মুখর অনুষ্ঠান মচ্ছব। 'মচ্ছব' কথাটির অর্থ মহোৎসব। মহোৎসব - মতসব - মচ্ছব। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগের থেকেই এক আনন্দ মুখর পরিবেশ তৈরি হয়। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গ্রামীন কৃষকেরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 723 - 729
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভগবানের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করে এবং গ্রামের সমস্ত কৃষক পরিবার এতে অংশ গ্রহণ করে। প্রসাদ হিসাবে থাকে – ভাত, শাক, শাক, লাবড়া, রসা, সবজি, চাটনি পায়েস ও বিভিন্ন প্রকারের ডাল।

ধান ঘরে তোলা শেষ। কাজের অবসর। কাজেই আনন্দ আর ধরেনা। সাধারন কৃষক সমাজ নিজের মনে মনে গেঁথে নেয় ছড়া, গান। এই মচ্ছব পর্বটির মধ্যে যে ছড়া ধর্মী গান পরিবেশন করে থাকে, তাকে বলা হয় ‘প্রেমধ্বনি'। এই ছড়া ধর্মী গানে কখনো উঠে আসে পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ভাবনা আবার কখনো উঠে আসে পৌরানিকতা। পৌরানিকতা বিষয়ক প্রেমধ্বনি গান –

“কি করগো নন্দরানী যশোধা রোহিনী — হ্যাঁ
কালিন্দীর তীরে বগা খাইছে নীলমণি —হ্যাঁ
আইলিয়া মাথার কেশ পাগলিনী প্রায় — হ্যাঁ
কালিন্দীর তীরে নিরখিয়া চায় — হ্যাঁ
মায়ের কান্দনে কানাই শ্রবনে ওশিল — হ্যাঁ
বাশীতে ছলনা করে বগাকে বধিল — হ্যাঁ।”[৮]

সামাজিক - প্রাকৃতিক বিষয় নিয়েও পংক্তি ভোজের আসরে প্রেমধ্বনির গান গায়। যে গানগুলিতে সামাজের নানা প্রসঙ্গ যেমন ধরা পরে তেমনি প্রকৃতির বহুবিধ প্রকাশও উঠে আসে। আসলে সাধারন মানুষ সকলের সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

গান :

“ওরে ও ভ্রমরা কত খাও মধু কমলা — হ্যাঁ
অল্প অল্প করে খাও — হ্যাঁ
বন্ধনে পড়িবা তুমি — হ্যাঁ
শীঘ্র চলিয়া যাইও — হ্যাঁ
শুদ্ধ নারীর সঙ্গ ধরে — হ্যাঁ
সারা নিশি মধু খেয়ে — হ্যাঁ।”[৯]

লোক পূজায় সমাজ চিত্র : লোক মননে সুদীর্ঘকাল ধরে লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকব্রত, লোকধর্ম, লোকপূজা প্রভৃতি লোক ঐতিহ্যের যে প্রবাহ ধারা তাঁদের নিজস্ব তাগিদে সৃষ্টি হয়ে যুগযুগ ধরে বয়ে চলেছে তাকেই আমরা বলি লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির প্রধান উপাদান লোকসমাজ। গবেষনা প্রবন্ধে লোকসমাজের লোক দেবদেবীর পূজা, রীতি নীতি, পূজা উপলক্ষে গান, আলপনা সবিতে লোক বিশ্বাসের ছড়াছড়ি। এই বিশ্বাসের উপর ভর করে যে পূজা, ব্রতাচার গড়ে উঠেছে তাতে লোক মানসের আর্থ সামাজিক চিত্র ধরা পরে। পূজা ব্রতাচারে ব্যবহৃত বিভিন্ন আলপনার চিত্র (চন্দ্র, সূর্য, তারা, পৃথিবী, ঘট, প্রদীপ, পুকুর), কুমারী, সধবা, নারী পুরুষদের মুখে বলা ছড়া, হাস্তর, গান গাওয়ার মধ্যদিয়ে আদিম যুগের আর্থ সামাজিক স্তরের উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত। প্রত্যেকটি পূজাব্রতের মূল উৎস উর্বরতাভিত্তিক জাদুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। সন্তান, পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি, শস্য কামনার মিলিত রূপ এই পূজাব্রত। সূর্য পূজা গানের মধ্যে যে সামাজিকতা, সমাজ বাস্তবতা লক্ষ্য করার মতো তা হল মিথের ব্যবহার। গানের পৌরানিক চরিত্রগুলো (রাম, লক্ষন, সীতা, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ) যেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। গায়কী ‘কালো জলে কৃষ্ণকে’ কাছে পেতে চেয়েছেন রাধার মতো। পারমার্থিক ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ এই পৌরানিক চরিত্রের উপস্থাপন।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের পূজা ব্রত, রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যথা –

প্রথমত : আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের পূজার অন্যতম বিশেষত্ব আলপনা। আলপনার বহুমাত্রিক নকশা চিত্র নারীমনের নান্দনিক সৌন্দর্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ। একসময় নারীদের কাছে বাইরের জগৎ ছিল অচেনা অজানা। মনের কোনে লালিত বহুদিনের বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় আলপনার মধ্যদিয়ে।

দ্বিতীয়ত : মূলত নারীরাই সংস্কৃতির ধারক বাহক। গবেষনা প্রবন্ধের যে কটি পূজাব্রত আলোচিত হয়েছে যেখানে নারীরাই প্রধান। একমাত্র মচ্ছব ছাড়া। তবে সেখানেও নারীরা উপস্থিত। কারন প্রসাদের রান্না থেকে আয়োজন সবই নারীর হাত দিয়ে হয়েছে। আসলে নারীরা সর্বমঙ্গলাময়ী। আপন সুখকে বিসর্জন দিয়ে সন্তান, স্বামীর সুখ আনন্দ কামনায় ব্যস্ত থাকেন। আর একারনেই পূজা ও ব্রত পালন।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে আলোচিত পূজা, ব্রতগুলি একসময় নম:শূদ্র সমাজের প্রতিটি বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত। যাকে কেন্দ্র করে সারা গ্রাম থাকত উৎসব মুখর। কিন্তু বিশ্বায়নের চাপে ও তাপে বর্তমানে পূজাগুলির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে বাসন্তী সরকার, শেফালী সরকারদের চোখে মুখে করুন হতাশার বানীই শোনা গেছে। তবে কোথায় কোথায় টিমটিম বেঁচে আছে।

Reference:

১. বাসনা সরকার (60), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম+পো : প্রমোদনগর, থানা : ফালাকাটা, জেলা : আলিপুরদুয়ার, তাং - ৭.৭.২০১০
২. ঐ
৩. ঐ
৪. শেফালী সরকার (৫৫), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম + পো : প্রমোদনগর, থানা : ফালাকাটা, জেলা : আলিপুরদুয়ার, তাং - ১৫.৭.২০১১
৫. বাসন্তী সরকার (৬০), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম + পো : ঝাড়শালবাড়ী, থানা : ধুপগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি
৬. ঐ
৭. সরস্বতী সরকার (61), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম + পো : শালবাড়ী, থানা : ধুপগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি, তাং - ২৫.৭.২০১১
৮. মায়া মন্ডল (55), পেশা : গৃহকর্ম, গ্রাম : গাদং, পো : ঝাড়শালবাড়ী, থানা : ধুপগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি, তাং - ১৫.৯.২০১১
৯. হরমোহন সরকার (58), গ্রাম + পো : প্রমোদনগর, থানা : ফালাকাটা, জেলা : আলিপুরদুয়ার, তাং - ১০.১২.২০১২

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), দেশ বিভাগ ও বাংলা উপন্যাস।
শেখর বন্দোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), জাতি, বর্ন, ও বাঙালী সমাজ।
অরবিন্দ কর (সম্পা), কিরাত ভূমি (শারদীয়া সংখ্যা)